6

দারিদ্র্য ও বৈষম্য
(Poverty and Inequality)

দারিদ্র্যের সঙ্গে অনুন্নতির সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দারিদ্র্য তীব্র হলে তা যেমন অনুন্নতিকে ডেকে আনে, তেমনই অনুন্নতির অর্থই হল দারিদ্র্যের একটি প্রকাশ। শব্দ দুটিকে তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে গণ্য করা চলে। কোনো একটি দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ দারিদ্র্যের শিকার হলে তখনই সে দেশটিকে অনুন্নত দেশ বলা যাবে। দারিদ্র্য তাই অনুন্নত দেশগুলির একটি অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

6.1. দারিদ্র্যের ধারণা
(The Concept of Poverty) ঃ

কে দরিদ্র ? কাকে বলে দারিদ্র্য ? এইসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া বড়ো কঠিন। প্রথমত, দরিদ্র, এই শব্দটি তো স্থান-নিরপেক্ষ নয়। মার্কিনী জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে, মার্কিন অর্থনীতিতে যাকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ভারতীয় জীবনযাত্রার পরিমাপ অনুযায়ী সে হয়তো আদৌ দরিদ্র নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো মানুষের দারিদ্র্য সাধারণত পরিমাপ করা হয় আয়ের মাপকাঠিতে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী যে মানুষটি দরিদ্র নয়, জীবনের অন্য সুযোগসুবিধার কথা ধরলে হয়তো তাকে দরিদ্রই মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন হিন্দু বিধবা, অর্থবৈভবে যিনি হয়তো অত্যন্ত বিত্তশালিনী, সামাজিক বিধিনিষেধের কথা মানলে তাকে হয়তো অত্যন্ত দরিদ্রই মনে হবে। দারিদ্র্যের অতএব কোন সংজ্ঞা হয় না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যের বিবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর বারেবারেই সেইসব সংজ্ঞার উপর বিভিন্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন আরেক দল অর্থনীতিবিদ।

তবে সাধারণভাবে দরিদ্র বলতে আয় কম, এমন মানুষকেই আমরা বুঝিয়ে থাকি। অর্থশাস্ত্রের চিরাচরিত আলোচনায় আয়কেই দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়ে এসেছে। কিন্তু আয়কে দারিদ্র্য-সূচক হিসেবে গণ্য করার প্রথম সমস্যা তার পরিমাণ নিয়ে। একটি মানুষের আয় কত হলে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না ? প্রাথমিকভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছিল এইভাবে : একটি মানুষের আয় যদি এতটাই কম হয় যে তা দিয়ে তার 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন'টুকুও কিনে উঠতে পারছে না তবে মানুষটিকে দরিদ্র বলা হবে।

সমস্যার এই সমাধান থেকেই সমস্যাটির দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে কী বোঝান হচ্ছে ? 'জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন', এই শব্দবন্ধটির অর্থও তো বদলে যায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। উদাহরণস্বরূপ, এদেশে আমরা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন বলতে বোঝাই প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরিটুকুকে। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু কম ক্যালোরি লাগে ততটুকু ক্যালোরি কেনার বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারে তবে তাকে আর দরিদ্র বলা হবে না, বরং বলা হবে লোকটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করছে। কিন্তু জীবনযাপনের ন্যূনতম মান সম্পর্কিত ধারণাটি উন্নত দেশগুলিতে ঠিক এমনটি নয়। সেখানে 'জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন' বলতে শুধু খাদ্য নয়, সেই সঙ্গে একটুকরো আশ্রয়, কিছু বস্ত্রাদি, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু বিলাস দ্রব্যের প্রয়োজনকেও বোঝানো হয়। এইসব সমস্যার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের আয়গত মাপকাঠিটি বিভিন্ন।

অবশ্য দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিতর্কটি যে কেবলমাত্র এই আয়ের পরিমাণগত বিভিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বস্তুত, এই সংজ্ঞা নিয়ে যেসব অর্থশাস্ত্রবিদ বিতর্ক করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তুলেছেন যে দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপের জন্য শুধু আয় নয়, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি ভোগের অধিকার কতটা আছে সে দিকেও নজর দিতে হবে। যে মানুষটির অর্থের কোনো অভাব

নেই, বিবিধ জিনিস ভোগের তার কতটা সুযোগ বা অধিকার আছে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ধনী মানুষ যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহলে টাকা থাকলেও তিনি সবকিছু ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাহলে, অর্থশাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন, আমরা কি আদৌ ঐ ধনী মানুষটিকে দরিদ্র নয় বলে চিহ্নিত করতে পারি ? এই সঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন। যে মানুষটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন, তার দুর্বল স্বাস্থ্যের একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে শৈশবে বা বাল্যে মানুষটি সুচিকিৎসার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ পাননি। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সঠিক স্বাস্থ্য পরিসেবা যোগান দিতে পারে না, আয়ের মাপকাঠিতে সবল হলেও তাকে কি ধনী বলা চলে ? দারিদ্র্য সংক্রান্ত আলোচনা এভাবেই বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতে আজকে মানব-বিকাশের মাপকাঠিতে দারিদ্র্যের পরিমাপের বিষয়টিতে এসে হাজির হয়েছে।

3.2. দারিদ্র্যের পরিমাপ (Measurement of Poverty) ঃ

দারিদ্র্যকে দু'ভাগে পরিমাপ করা যায়। **প্রথমত,** দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা হয় কোনো মানুষ তার উপার্জিত অর্থের সাহায্যে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারছে কিনা। **দ্বিতীয়ত,** মানব বিকাশভিত্তিক দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটা মানুষ তার পছন্দের জীবনযাপনের সুযোগ থেকে কতটা বঞ্চিত তা বিচার করা হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে হিসাব করা হয় কোনো মানুষের আয় জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য যে পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন তার থেকে কতটা কম। অন্যদিকে, সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর (decent) জীবনযাপনের জন্য যতটা সক্ষমতার প্রয়োজন, কোনো মানুষ তার চেয়ে কতটা কম সক্ষম তা বিচার করা হয়।

6.2.1. দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ (Income Measure of Poverty) ঃ

আয়ের (বা কারো কারো মতে ব্যয়ের) পরিমাণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল **দারিদ্র্য রেখার** ধারণাটি। জীবনের প্রাথমিক কিছু প্রয়োজন, যেমন খাদ্য ও বস্ত্র, সংগ্রহে অপরাগতাকে যদি দারিদ্র্য বলে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে এই 'ন্যূন্যতম প্রয়োজন' মেটাতে যে টাকা লাগে তাকেই দারিদ্র্য রেখা বলে। দারিদ্র্য রেখা অতএব একটি সুনির্দিষ্ট আয়স্তর, ন্যূনতম প্রয়োজনের ধারণাটি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে যা পাল্টে যায়। দারিদ্র্যের আয়ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুযায়ী যে সমস্ত মানুষ (বা পরিবার) এই দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে, অর্থাৎ যারা এই ন্যূনতম অর্থটুকুও উপার্জন করে উঠতে পারে না, তারাই দরিদ্র এবং এদের এই দারিদ্র্যকে **চরম দারিদ্র্য** (absolute poverty) হিসেবে অভিহিত করা হয়। 1990 সালের ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্টে একটি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার কথা উল্লেখ করা হয়। আন্তর্জাতিক এই দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়স্তরটি হল প্রতিদিন মাথাপিছু এক ডলার। রিপোর্ট অনুযায়ী 1985 সালের ক্রয়ক্ষমতার সমতা নির্ধারণকারী দামস্তর (Purchasing power parity price) অনুযায়ী আয়ের হিসাবটি করা হবে। এই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখাটি ঘোষণা করার কারণ বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের ভয়াবহতার একটি তুলনামূলক পরিমাপ করা। সারা পৃথিবীব্যাপীই অতঃপর যে সব মানুষের দিনপ্রতি উপার্জন ক্রয়ক্ষমতার হিসাবে এক ডলারের কম হবে তাকেই দরিদ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

মাথাগুণতি সূচক (Headcount Index) ঃ দারিদ্র্য রেখাটি, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে হলে দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়স্তরটি, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলে যায়। কারণ, দেশ থেকে দেশান্তরে বদলে যায় ন্যূনতম প্রয়োজন সংক্রান্ত ধারণাটি। কিন্তু একবার এই রেখাটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে পারলে কোনো দেশের মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যাটি বের করে ফেলা খুবই সহজ। যে সমস্ত মানুষের আয় দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয়ের চেয়ে কম হবে স্রেফ তাদের মাথাগুনে নিলেই কোন দেশের মোট দরিদ্রের হিসাবটি পাওয়া যাবে।

তবে দরিদ্রের কেবল এই মাথাগুনতি হিসাব থেকে কোনো দেশের দারিদ্র্যের ভায়াবহতা সম্বন্ধে কিছুই আঁচ করা যায় না। ফলত এই হিসাবের সাহায্যে দুটি দেশের দারিদ্র্যের মাত্রার তুলনামূলক পরিমাপও সম্ভবপর হয় না। তুলনার জন্য প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক হিসাবের। মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে মোট দরিদ্রের সংখ্যা এমনই একটি হিসাব। দারিদ্র্য পরিমাপের এই আপেক্ষিক হিসাবটিকে বলা হয় **মাথাগুনতি সূচক**। যদি কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা N হয় এবং তার মধ্যে H সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে তাহলে

মাথাগুণতি সূচক = $(H/N) \times 100$

অর্থাৎ মাথাগুণতি সূচকের সাহায্যে কোনো দেশে শতকরা কতজন মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে আছে তা জানা যায়। কিন্তু এই সূচকটিকেও দারিদ্র্যের খুব একটা ভাল পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ এই পরিমাপের সাহায্যে কোন দেশের 'দারিদ্র্যের গভীরতা' সম্পর্কে কোনো আন্দাজ পাওয়া যায় না। 'দারিদ্র্যের গভীরতা' বলতে আমরা বলতে চাইছি একজন ব্যক্তি দারিদ্র্য রেখার থেকে ঠিক কতটা নীচে আছে অথবা একটি দেশের গরীব মানুষেরা সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য রেখার কতটা নীচে আছে।

মাথাগুণতি সূচকের সাহায্যে দারিদ্র্য পরিমাপের আরো অসুবিধা আছে। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হলে অনেক সময় দেখা যায়, যারা ক্ষমতায় আছে তারা দেশের দারিদ্র্যকে নির্বাচনী লড়াই জেতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যে সমস্ত মানুষ দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি আছে, অর্থাৎ দারিদ্র্যের প্রকোপ যাদের কম ভোগ করতে হচ্ছে, তাদেরকে সরকার এককালীন থোক কিছু টাকা সাহায্য দিচ্ছে বা তাদের সাময়িক কোন কাজের সুযোগ দিচ্ছে। এর ফলে সাময়িকভাবে কিছু মানুষ দারিদ্র্য রেখার উপর উঠে আসছে, মাথাগুণতি দারিদ্র্য সূচকটির মান কমছে আর শাসকপক্ষ সদম্ভে তাদের এই সাফল্য ঘোষণা করে পুনর্নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে নিচ্ছে। মাথাগুনতি সূচকের এই সব সীমাবদ্ধতার কারণে বিকল্প সূচক হিসেবে দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকটির উদ্ভব।

দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক (Proverty-Gap Index) ঃ কোনো দেশের দারিদ্র্যের গভীরতার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হল দারিদ্র্য-ব্যবধান। দারিদ্র্য-ব্যবধানের সাহায্যে যা আসলে পরিমাপ করা হয় তা হল প্রকৃত আয় ও দারিদ্র্য-রেখা নির্দেশিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু। দারিদ্র্য-ব্যবধান একটি সামগ্রিক হিসেব। কোন দেশে যতজন গরীব মানুষ আছেন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের-ব্যবধান হিসেব করে ঐ দেশের মোট দারিদ্র্য-ব্যবধানটুকু পাওয়া যায়। ধরা যাক y_p হল দারিদ্র্য রেখা নির্দেশিত আয় এবং y_i হল i-তম মানুষটির উপার্জন। সেক্ষেত্রে দারিদ্র্য ব্যবধান = $\sum_{i=1}^{H}(y_p - y_i)$ যেখানে H হল দারিদ্র্য রেখার নীচে লোকের সংখ্যা।

অর্থাৎ দারিদ্র্য-ব্যবধানের ধারণাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপর টেনে তুলতে হলে মোট আয় কতটা বাড়ানো প্রয়োজন বা মোট কতটা অর্থের প্রয়োজন।

দারিদ্র্য ব্যবধানের এই হিসেবটিকে সাধারণত একটি অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের একটি তুলনামূলক হিসেবের জন্যই এমনটি করা হয়। এই অনুপাতটিকে বলা হয় দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক। কোনো দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনার জন্য প্রয়োজনীয় গড় আয় এবং ঐ দেশের গড় আয়, এই দুইয়ের অনুপাতকেই বলা হয় দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক। যদি কোনো দেশের গড় আয় M হয় তাহলে দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচক (PGI)-টি হবে,

$$PGI = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_p - y_i)/N}{M} = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_p - y_i)}{MN}$$ যেখানে N হল মোট জনসংখ্যা।

আয়-ব্যবধান সূচক (Income-Gap Index) : মাথাগুনতি সূচকের মত দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যেও প্রকারভেদ থাকে। আয়-বৈষম্যের কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। কেউ হয়তো সামান্য গরিব, কেউ বা ভীষণ গরিব। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে আয়-বৈষম্য সূচকের সঙ্গে আয়-ব্যবধান সূচকের তফাৎ অতি সামান্য। দারিদ্র্য-ব্যবধান সূচকের ক্ষেত্রে আমরা দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উপরে তুলে আনার জন্য প্রয়োজনীয় গড় আয়কে দেশটির গড় আয় দিয়ে ভাগ করি। অন্যদিকে আয়-ব্যবধান সূচকের ক্ষেত্রে মোট দারিদ্র্য-ব্যবধানকে দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষের মোট আয় দিয়ে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যদি H হয় আর তারা সবাই দারিদ্র্য রেখার ঠিক উপরে আছে ধরে নিলে (অর্থাৎ প্রত্যেকের আয় y_p ধরে নিলে) আয়-ব্যবধান সূচক (IGI)-টি হবে, $IGI = \frac{\sum_{i=1}^{H}(y_p - y_i)}{y_p.H}$

এভাবে হিসাব করার উদ্দেশ্য হল দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের (বা আয়ের) দরকার মোট আয়ের তুলনায় তা কতটা সেটা দেখা।

ফস্টার-গ্রিয়ার-থরবেক সূচক (Foster-Greer-Thorbecke Index) : দারিদ্র্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে আয়-ব্যবধান সূচকটিরও কিছু ত্রুটি আছে। সূচকটির সাহায্যে দরিদ্রদের মধ্যেও যে আয়-বৈষম্য বর্তমান তা পরিমাপের চেষ্টা করা হলেও দারিদ্র্যের বণ্টনজনিত দিকটিকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে ফস্টার-গ্রিয়ার-থরবেক সূচকে। ফস্টার, গ্রিয়ার এবং থরবেক যে মাপকাঠিটির কথা বলেছেন তা সাধারণভাবে P_α শ্রেণির মাপকাঠি হিসেবে পরিচিত।

$$P_\alpha = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{H}\left(\frac{y_p - y_i}{y_p}\right)^\alpha .$$

এই সমীকরণে α-র বিভিন্ন মান বসিয়ে আমরা দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি পেতে পারি। যেমন $\alpha = 0$ হলে P_α সূচকটি মাথাগুণতি সূচকটির অনুরূপ হবে। আর যখন $\alpha = 2$ হবে, তখন

$P_2 = HI\ [\ IGI^2 + (1–IGI)^2(CV_p)^2\ ]$

হবে। CV_p এক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষদের আয়ের বিচ্যুতির (গড় আয় থেকে বিচ্যুতির) এক ধরনের পরিমাপ। এই P_2 পরিমাপ অনুযায়ী যদি HI, IGI বা CV_p বাড়ে তাহলে দারিদ্র্যও বাড়বে।

6.2.2. দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপ (Capability Measure of Poverty) :

আয়ভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা জীবনের প্রাথমিক কয়েকটি প্রয়োজন থেকে বঞ্চনাকেই দারিদ্র্য হিসেবে ব্যাখ্যা করছিলাম। সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে এই 'প্রাথমিক প্রয়োজন'-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে আরেকটু প্রসারিত করা হয়েছে প্রয়োজনের তালিকাটিকে। কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনটুকু কোনোমতে মিটে যাওয়ার অর্থই কি বেঁচে থাকা ? বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেমন খাদ্য চায়, বস্ত্র চায়, মাথা গোঁজার ঠাঁই চায়, তেমনই সে চায় সবকিছু জানতে, শিখতে। শুধু কোনোমতে বেঁচে থাকা নয়, সে চায় একটু সুন্দরভাবে বাঁচতে। চায় দীর্ঘ জীবনও। মানুষের এই সব আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েই আমাদের দারিদ্র্যের পরিমাপ করতে হবে, সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের এটিই মূল কথা। দারিদ্র্যের সক্ষমতাভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে তাই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—আয়ুষ্কাল, শিক্ষার মান ও জীবনযাত্রার মান। 1997 সাল থেকে সক্ষমতার এইসব ধারণার ভিত্তিতে ইউ.এন.ডি.পি. দারিদ্র্য পরিমাপের যে সূচকটির প্রবর্তন করে তার নাম দেওয়া হয় মানব দারিদ্র্য সূচক। মানব দারিদ্র্য সূচকের মাপকাঠিও ঐ তিনটিই—আয়ুষ্কাল,

শিক্ষার মান ও জীবনযাত্রার মান। বস্তুত ইউ.এন.ডি.পি. যে মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে সেখানেও এই তিনটিই উন্নতি পরিমাপের মাপকাঠি। অর্থাৎ মানব উন্নয়ন সূচক যেখানে প্রাপ্তির দিকটি বিবেচনা করে, মানব দারিদ্র্য সূচক সেখানে বঞ্চনার পরিমাণটি হিসেব করে। মানব উন্নয়ন সূচক ও মানব দারিদ্র্য সূচককে তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে গণ্য করা চলে।

□ **মানব দারিদ্র্য সূচক** (Human Poverty Index) ঃ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং ঠিকমত শিক্ষালাভ, এই তিনটি সুযোগ থেকে কোনো দেশের নাগরিকরা কতটা বঞ্চিত তা দিয়েই সেই দেশের দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপ সম্ভব। দারিদ্র্যের এমনতরো পরিমাপকে বলা হয় মানব দারিদ্র্য সূচক।

বিকাশশীল দেশগুলিতে সাধারণত এটা দেখা যায় যে যারা গরিব তারা খুব অল্প বয়সেই মারা যাচ্ছে। যথাযথ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবেই এটা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে মানুষ কতটা বঞ্চিত তা পরিমাপের জন্য তাই মাপকাঠি হিসবে ধরা হয় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে, জন্মের পর কোনো মানুষের চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা, সেটিকে।

অন্যদিকে জ্ঞানলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চনার অর্থ লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা। প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতার হার থেকেই এই বঞ্চনার হিসেবটা নেওয়া হয়।

1997 সালে যখন ইউ. এন. ডি.পি. মানব দারিদ্র্য পরিমাপ শুরু করে তখন সুন্দর জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চনার হিসেব করার জন্য তিনটি মাপকাঠিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এক, মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন পরিস্রুত জল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দুই, শতকরা কতজন শিশুর ওজন তাদের বয়সের তুলনায় কম। এবং তিন, জনসংখ্যার শতকরা কতজন স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অভাবে 2003 সাল থেকে তৃতীয় মাপকাঠিটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটি মাপকাঠির গড় হিসেব দিয়েই এখন হিসেব করা হচ্ছে কোনো দেশের মানুষ সুন্দর জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে কতটা বঞ্চিত।

মানব দারিদ্র্য সূচক অতএব তৈরি করা হয় বঞ্চনার উপরোক্ত তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। এই সূচক প্রকৃতপক্ষে তিনটি চলরাশি P_1, P_2 ও P_3-এর গুরুত্বশীল গড় যেখানে

P_1 = জন্মের সময় 40 বছরের বেশি না বাঁচার সম্ভাবনা (এটিকে 100 দিয়ে গুণ করা হয়)

P_2 = বয়স্ক নিরক্ষরতার হার

P_3 = জনসংখ্যার কতজন পরিস্রুত জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং কতজন শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম, এই দুইয়ের সাধারণ গড়। কোনো দেশে এই তিনটি চলরাশির মান নির্ধারণ করার পর নীচের সমীকরণটির সাহায্যে মানব দারিদ্র্য সূচক (HPI)-টির পরিমাপ করা হয় ঃ

$$HPI = [\tfrac{1}{3}(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha})]^{1/\alpha}.$$

এখানে α একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটির মান বাড়ার অর্থ বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি। যদি $\alpha = 1$ হয় তাহলে মানব দারিদ্র্য সূচকটি বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার সাধারণ গড়ের সমান হবে। বঞ্চনার মাত্রাগুলি যত বাড়বে, সূচকের মানও তত বড় হবে।

UNDP কোন দেশের মানব দারিদ্র্য সূচক নির্ণয় করার সময় $\alpha = 3$ এই মান ব্যবহার করে। $\alpha = 3$ ব্যবহার করার কারণ হল, যেক্ষেত্রগুলিতে বঞ্চনা পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা। 2004 সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব দারিদ্র্য সূচকের ক্ষেত্রে 2003 সালে ভারতের ক্রম-অবস্থান ছিল 96 টি দেশের মধ্যে 48। 2002 সালে এই অবস্থান ছিল 96 টি দেশের মধ্যে 53।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠনের (Organisation for Economic Co-operation and Development বা OECD) কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে মানব দারিদ্র্য সূচকে তিনটির স্থানে চারটি উপাদান বিবেচিত হয়। উপরোক্ত তিনটি বঞ্চনা ছাড়াও সামাজিক পরিত্যাগের (social exclusion) বঞ্চনাও বিবেচনা করা হয়। এখানে UNDP-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-1 দ্বারা সূচিত করা হয় এবং .OECD-র মানব দারিদ্র্য সূচককে HPI-2 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। HPI-2 হিসাব করার সূত্র হল নিম্নরূপঃ

$$HPI\text{–}2 = [\tfrac{1}{4}(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha} + P_4^{\alpha}))]^{1/\alpha}.$$

যেখানে P_1 = জন্মের পর আয়ু 60 বছরের বেশি না হওয়ার সম্ভাবনা (100 গুণ)
P_2 = প্রাপ্ত বয়স্কদের কার্যকর সাক্ষরতার অভাব,
P_3 = আয়-দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থানকারী জনসমষ্টি,
P_4 = দীর্ঘকালীন (একবছর বা তার বেশি) বেকারত্বের হার।
$\alpha = 4$

লক্ষণীয় যে, $\alpha = 1$ হলে উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশের ক্ষেত্রে মানব দারিদ্র্য সূচক মূল বঞ্চনার পরিমাপগুলির সরল যৌগিক গড়ে পরিণত হয়।

6.3. আয় বণ্টনে অসমতা (Distributional Inequality of Income) :

পৃথিবীর সর্বত্রই আয় বণ্টনে কম বেশি অসমতা দেখা যায়। এই অসমতা যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় একই দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বছর সারা পৃথিবী জুড়ে যে উৎপাদন হয় তার একটা বড় অংশ যেমন আমেরিকার, তেমনই খুব কমই ভারতের। একইভাবে ভারতে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে মোট জাতীয় আয়ের যে পরিমাণ জোটে, সমপরিমাণ আসামের ভাগ্যে জোটে না। আয় বণ্টনে এই অসমতা দারিদ্র্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এক সময় পৃথিবীর মোট আয়ের তীব্র অসম বন্টনের ফলে যেমন কিছু কিছু দেশ উন্নত আর কিছু দেশ অনুন্নত হয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনই একটি দেশের বিভিন্ন অংশে আয় বণ্টনে বৈষম্যের ফলে প্রতিদিনই কিছু না কিছু মানুষ দারিদ্র্যের কবলে গিয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় আয় বৈষম্য তাই সর্বদাই একটি প্রাণবন্ত বিষয়। অর্থনীতিবিদরাও ফলত সর্বদাই বণ্টন-পরিমাপ এবং বিকাশ ও বৈষম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

আয়ের বণ্টন বৈষম্যকে সাধারণত দু'ভাবে পরিমাপ করা হয়। একটি পরিমাণগত বণ্টন, অন্যটি কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টন। পরিমাণগত বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিমাণটুকুকেই বিবেচনা করা হয়। এই আয় কোত্থেকে এল তা বিবেচনা করা হয় না, দেখা হয় না আদৌ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে এই অর্থ উপার্জিত হয়েছে কিনা সেটুকুও। অন্যদিকে কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের দরুন উপার্জিত আয়কেই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। কোনটি আয় আর কোনটি আয় নয়, তা এইভাবে ঠিক করে নেওয়ার পরই বণ্টন-বৈষম্যের হিসাব নেওয়া হয়।

6.3.1. আয়ের পরিমাণগত বণ্টন (Size Distribution of Income) :

আয়ের পরিমাণগত বণ্টন বলতে বোঝায় কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দেশটির মোট আয়ের বণ্টন। জনসংখ্যার এই শ্রেণিবিভাগ আবার করা হয় আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতেই অর্থাৎ আয় যাদের খুব বেশি তারা উচ্চবিত্ত, আয় যাদের মোটামুটি বেশি তারা হয়তো উচ্চ মধ্যবিত্ত, যাদের আয় মাঝারি তারা মধ্যবিত্ত, আরেকটু কম আয় হলে নিম্ন মধ্যবিত্ত, অতঃপর নিম্নবিত্ত, এই রকম। তবে আয়ের ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যাকে ঠিক ক'ভাগে ভাগ করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। পাঁচও হতে পারে, দশও হতে পারে। জনসংখ্যাকে আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে ভাগ করে ফেলার পর দেখা হয় মোট আয়ের শতকরা কত ভাগ কোন শ্রেণির হাতে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে কতজন মানুষ আছে তার হিসাব নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণি হয়ত মোট আয়ের 20 শতাংশ নিজের দখলে রেখেছে। এখন জনসংখ্যার ঠিক 20 শতাংশ মানুষই যদি ঐ শ্রেণিভুক্ত হয়, মানে জনসংখ্যার 20 শতাংশ যদি আয়ের 20 শতাংশ ভোগ করে তবে বলা যায় দেশটিতে আয়-বৈষম্য একেবারেই নেই। তবে বাস্তব চিত্রটা ঠিক এর উল্টো। একটি কাল্পনিক উদাহরণ, যে উদাহরণ বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি, তার সাহায্যে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সারণি 6.1

ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণগত বণ্টন

ব্যক্তি	ব্যক্তিগত আয় (মোট আয়ের শতাংশ হিসাবে)	মোট আয়ে জনসংখ্যার কোন গ্রুপ বা দলের শতকরা অংশ
1	1.4	4.0
2	2.6	
3	3.7	9.0
4	5.3	
5	6.5	14.0
6	7.5	
7	9.3	21.0
8	11.7	
9	24.2	52.0
10	27.8	
মোট	100.0	100.0

কাল্পনিক এই উদাহরণে (সারণি 6.1) প্রথম দুই ব্যক্তি, সবচেয়ে গরিব দুজন, মোট আয়ের মাত্র 4 শতাংশ উপার্জন করে। আমাদের উদাহরণে মোট জনসংখ্যা যেহেতু দশ, সেহেতু বলা যায় জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র 20 শতাংশ মোট আয়ের 4 শতাংশ পায়। উদাহরণটিতে আরো দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ মোট আয়ের 52 শতাংশ দখল করে নিচ্ছে। অর্থাৎ জনসংখ্যার আয়গত শ্রেণিবিভাগ এবং মোট আয়ে সেই সব শ্রেণির ভাগের হিসাব থেকে কোনো দেশে আয়-বৈষম্যের মাত্রাটি কেমন তা জানা যায়। আমাদের কাল্পনিক দেশটিতে আয়-বৈষম্যের মাত্রাটি ভয়ংকর।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অনুপাতের কথা প্রায়ই বলা হয়। অনুপাতটি কুজনেৎস্ অনুপাত হিসেবেই পরিচিত। কুজনেৎস্ অনুপাতটি জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ ও সবচেয়ে দরিদ্র 20 শতাংশের আয়ের একটি অনুপাত। যে দেশে আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বেশি, সে দেশে কুজনেৎস্ অনুপাতের মান তত বেশি।

6.3.1.A. লোরেঞ্জ রেখা (Lorenz Curve) ঃ লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে কোনো দেশের আয় বৈষম্যের পরিমাপ করা হয়। লেখচিত্রটি একটি বর্গাকৃতি ক্ষেত্রে আবদ্ধ। এই বর্গক্ষেত্রের যেটি কর্ণ সেটিকে বলা হয় সমতা রেখা। এই রেখা থেকে বিচ্যুতিই হল অসমতা, বৈষম্য। এই বিচ্যুতিরই পরিমাপ করা হয় লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে।

কোনো দেশের আয় বৈষম্যকে লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে প্রকাশ করার জন্য আয়ের পরিমাণগত বণ্টনের ধারণাটির সাহায্য নেওয়া হয়। যে বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে এই রেখাটি আঁকা হয় তার উল্লম্ব অক্ষ বরাবর পরিমাপ করা হয় জনসংখ্যার কোন শ্রেণি আয়ের শতকরা কত অংশ পায় তার হিসাব। অন্যদিকে অনুভূমিক অক্ষ বরাবর পরিমাপ করা হয় জনসংখ্যার শতকরা অংশের হিসাবটি। অর্থাৎ বর্গাকার ক্ষেত্রের প্রতিটি বিন্দু থেকে জানা যায় জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ আয়ের শতকরা কত অংশ পায়, সেই হিসেব। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, জনসংখ্যার শতকরা অংশের হিসাবটি, অনুভূমিক অক্ষ বরাবর যেটি পরিমাপ করা হচ্ছে, মূল বিন্দু থেকে যত এগোনো যাবে ততই সেই হিসাবটির মান বাড়বে। একই নিয়ম প্রযোজ্য আয়ের শতকরা অংশের হিসাবটির ক্ষেত্রেও। যে লোরেঞ্জ রেখাটি এখানে আঁকা হয়েছে তার A বিন্দুর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশটির সবচেয়ে দরিদ্র 20 শতাংশ মানুষ মোট আয়ের 8 শতাংশ পায়।

লোরেঞ্জ রেখা আঁকার সময় দুই অক্ষ বরাবর আয় এবং জনসংখ্যা, এই দুটি চলরাশিরই শতকরা হিসেবে পরিমাপ করা হয়। শতকরা হিসেবের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রা যেহেতু 100, সেহেতু এক্ষেত্রে দুটি অক্ষেরই দৈর্ঘ্য সমান হবে। এই কারণেই যে চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্রে রেখাটি আঁকা হয় তা বর্গাকার।

সারণি 6.1-এ আয় বৈষম্যের যে কাল্পনিক উদাহরণটি দেখানো হয়েছে তারই চিত্ররূপ 6.1 নং ছবির লোরেঞ্জ রেখা। এই লোরেঞ্জ রেখা OABCDO′-এর A বিন্দু থেকে জানা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র 20 শতাংশ উপার্জন করছে মোট আয়ের 8 শতাংশ, B বিন্দু থেকে জানা যাচ্ছে জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র 40 শতাংশ উপার্জন করছে মোট আয়ের 13 শতাংশ ইত্যাদি। সুতরাং এই লোরেঞ্জ রেখা অনুযায়ী দেশটিতে আয় বৈষম্য চরম মাত্রায় আছে। এই বৈষম্য যত কমে আসবে লোরেঞ্জ রেখাটি তত OO′ রেখাটির কাছে সরে আসবে এবং বৈষম্য যদি পুরোপুরি অদৃশ্য হয় তাহলে লেরেঞ্জ রেখাটি OO′ রেখাটির সঙ্গে মিশে যাবে। লোরেঞ্জ রেখাটি OO′ রেখার সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাবার অর্থ জনসংখ্যার, উদাহরণস্বরূপ, 10 শতাংশ মানুষ মোট আয়ের ঠিক 10 শতাংশই ভোগ করছে। এই কারণেই OO′ রেখাটিকে সমতা রেখা বলা হয়। লোরেঞ্জ রেখাটি যত এই সমতা রেখা থেকে সরে যাবে তত বাড়বে বৈষম্য। কোনো দেশে যদি এমন হয় যে দেশের জাতীয় আয়ের সবটাই পাচ্ছে একটিমাত্র মানুষ, বাকিরা কিছুই পাচ্ছে না, তাহলে তার অর্থ দেশটিতে চরম আয় বৈষম্য আছে। এমন হলে লোরেঞ্জ রেখাটি নীচের অনুভূমিক অক্ষ এবং ডানদিকের উল্লম্ব অক্ষের সঙ্গে মিশে যাবে।

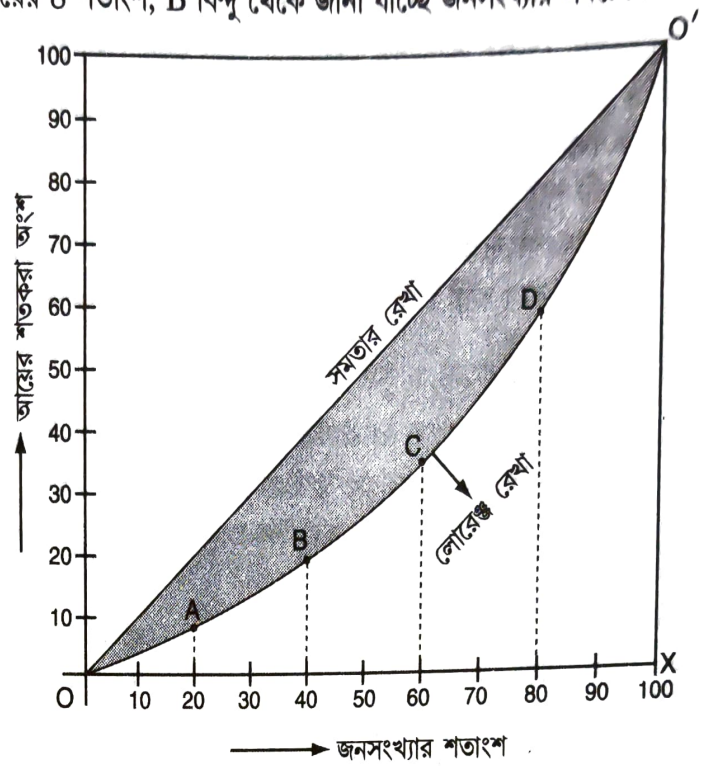

চিত্র ঃ 6.1

6.3.1.B. গিনি সহগ (Gini Coefficient) ঃ লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে আয় বৈষম্য পরিমাপের আরেকটি মাপকাঠিতে উপনীত হওয়া যায়। ইতালিয়ান পরিসংখ্যানবিদ সি. গিনি'র নামানুসারে এই মাপকাঠিটির নামকরণ করা হয়েছে গিনি সহগ। লোরেঞ্জ রেখা ও সমতা রেখার মধ্যবর্তী ক্ষেত্র এবং সমতা রেখার ডানদিকের পুরো জায়গাটির অনুপাতটিকেই গিনি সহগ (G) বলে অর্থাৎ

$$G = \frac{\text{OABCDO′ ক্ষেত্রের আয়তন}}{\text{OXO′ ক্ষেত্রের আয়তন}}$$

কোনো দেশের আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে সমতা রেখা ও লোরেঞ্জ রেখার মধ্যবর্তী জায়গাটুকুর আয়তন (OABCOO′) তত বাড়ে। ফলত আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে গিনি সহগের মান তত বাড়ে।

গিনি সহগের মান শূন্য থেকে অসীম পর্যন্ত যে কোনো কিছুই হতে পারে। দেশটিতে একেবারেই কোনো আয় বৈষম্য না থাকলে গিনি সহগের মান শূন্য এবং আয় বৈষম্য চরম মাত্রার হলে গিনি সহগের মান অসীম হবে। তবে সাধারণত এই সহগটির মানটিকে 0.7 (যেখানে মোটামুটি ভাল মাত্রার বৈষম্য আছে) থেকে 0.2 (যেখানে মোটামুটি সমতা বজায় আছে)-এর মধ্যেই থাকতে দেখা যায়।

6.3.2. আয়ের কর্মগত বা বৃত্তিগত বণ্টন (Functional Distribution of Income) ঃ

আয়ের বৃত্তিগত বণ্টন বলতে বোঝায় বিভিন্ন ব্যক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে সেই ভূমিকা অনুযায়ীই তাকে আয়ের ভাগ দেওয়া। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে একজন ব্যক্তি নিজে কতটা আয় করছে সেটি নয়, এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি বিশেষ উৎপাদনী উপাদান সামগ্রিকভাবে কতটা আয় করছে সেটির উপরেই। দেখা হয় মোট জাতীয় আয়ে ঐ উপাদানটির অবদান কত। যেমন, মোট জাতীয়

আয়ের শতকরা কতটা শ্রমিক শ্রেণির উপার্জন, কত শতাংশ পুঁজিপতি শ্রেণির অবদান প্রভৃতি। অর্থাৎ আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের সাহায্যে আমরা আসলে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আয়ের বণ্টন বৈষম্যকে পরিমাপ করি, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আয়ের বণ্টন বৈষম্যকে নয়।

যে কোন দেশেই সাধারণত দেখা যায় মোট জাতীয় আয়ের গরিষ্ঠাংশ যায় পুঁজিপতি শ্রেণির ভাগে, তুলনায় স্বল্পতর অংশ পায় শ্রমিক শ্রেণি। কিন্তু আয়ের অসমান বণ্টনের সমাপ্তি কেবলমাত্র এখানেই নয়। পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে সবাই যেমন সমহারে মুনাফা অর্জন করে না, তেমনি শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও সবাই সমান মজুরি পায় না। কিন্তু এই আন্তঃশ্রেণি বণ্টন বৈষম্যের হিসাব আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের সাহায্যে করা যায় না। অথচ কোনো একটি শ্রেণির বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আয় বণ্টনের বৈষম্যও কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয় বৈষম্য পরিমাপে তাই আয়ের বৃত্তিগত বণ্টনের বিশেষ ব্যবহার নেই।

6.4. উন্নয়ন ও বৈষম্য ঃ কুজনেৎসের প্রকল্প (Development and Inequality : Kuznets' Hypothesis) ঃ

মাথাপিছু আয়ের অঙ্কেই সাধারণত উন্নয়নের পরিমাপ করা হয়। মাথাপিছু আয় বাড়লে যেমন অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটছে ধরে নেওয়া হয় তেমনি উন্নয়নের মাত্রা কমলে মাথাপিছু আয় কমে। অর্থশাস্ত্রবিদ সাইমন কুজনেৎসের মতে, মাথাপিছু আয় পরিবর্তনের সঙ্গে আয় বৈষম্যেরও একটি সম্পর্ক আছে। মাথাপিছু আয় বাড়লে প্রথম দিকে বৈষম্য বাড়ে, তারপর কিন্তু তা কমতে থাকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক পর্বে আয় বৈষম্য বাড়ে। সমতা আসে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অর্জনের পর।

1955 সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যের সম্পর্কটি অনুধাবনের জন্য একটি সমীক্ষার কাজ করেছিলেন কুজনেৎস্। এই গবেষণায় মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ মানুষ ও সবচেয়ে গরীব 20 শতাংশ মানুষের আয়ের অনুপাতকে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আসলে বিকাশ ও বৈষম্যের সম্পর্কটি সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায় যদি এই দুই মাপকাঠি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি একেকটি দেশের ক্ষেত্রে পরপর কয়েক বছর ধরে পাওয়া যায়। কিন্তু মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের হিসাবটি এভাবে পাওয়া গেলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক কুজনেৎস্ তাই বিভিন্ন দেশের এক বছরের হিসেব থেকেই এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন তিনটি বিকাশশীল (ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পুয়ের্তো রিকো) এবং দুটি উন্নত দেশ (আমেরিকা ও ব্রিটেন)। অর্থাৎ তিনি Time Series data বা কালানুসারী তথ্যের অভাবের দরুন তার পরিবর্তে Cross Section data বা একই সময়কালের বিভিন্ন শ্রেণির দেশের আয় বণ্টন ও বৈষম্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই দেশগুলির আয় বণ্টনের শতকরা হিসাব এবং তাদের অনুপাত সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি 6.2 নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এই সারণির তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে আয় বণ্টনে বৈষম্যের মাত্রাটি সাধারণভাবে উন্নত দেশগুলির চেয়ে বিকাশশীল দেশগুলিতে বেশি। এই বিষয়টি লক্ষ করেই কুজনেৎস বলেছিলেন, কোনো অর্থনীতির বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে বণ্টন বৈষম্য বাড়ে এবং পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে।

সারণি 6.2

দেশ	মোট আয়ে শতকরা অংশের হিসাব		2 নং সাপেক্ষে
	সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ	সবচেয়ে গরিব 60 শতাংশ	3 নং পর্যায়ের অনুপাত
(1)	(2)	(3)	(4)
শ্রীলংকা (1950)	30	50	1.67
ভারত (1949-50)	28	55	1.96
পুয়ের্তো রিকো (1948)	24	56	2.33
আমেরিকা (1950)	34	44	1.33
ব্রিটেন (1947)	36	45	1.25

কুজনেৎসের এই প্রকল্পটিকে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে আমরা একটি রেখাচিত্র পাব যা উল্টানো U আকৃতির। যে 6.2 নম্বর লেখচিত্রে আমরা এই রেখাটি এঁকেছি তার অনুভূমিক অক্ষ বরাবর মাথাপিছু আয় এবং উল্লম্ব অক্ষ বরাবর আয় বণ্টনে অসমতার মাত্রাটি পরিমাপ করা হয়েছে। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে X বিন্দু পর্যন্ত মাথাপিছু আয় যত বেড়েছে, বৈষম্যের মাত্রাও তত বেড়েছে, এবং তারপর মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যের মাত্রা কমেছে। এর অর্থ কোনো দেশের মাথাপিছু আয় যতক্ষণ না একটি নির্দিষ্ট স্তর (এখানে X) পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুফলটি যাবে দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায়ের হাতে ; জাতীয় আয় বাড়বে, মাথাপিছু আয় বাড়বে, আয় বৈষম্যও বাড়বে। মাথাপিছু আয় ঐ নির্দিষ্ট স্তরটি অতিক্রম করার অর্থ দেশটিতে অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা একটি মোটামুটি স্তরে পৌঁছেছে ; শিক্ষার হার বেড়েছে, সচেতনা বেড়েছে, বিত্তশালী সম্প্রদায় আর আয়ের গরিষ্ঠাংশ নিজের দখলে রাখতে পারছে না। মাথাপিছু আয় একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করার পর তাই আয় বাড়লে বৈষম্য কমে আসে।

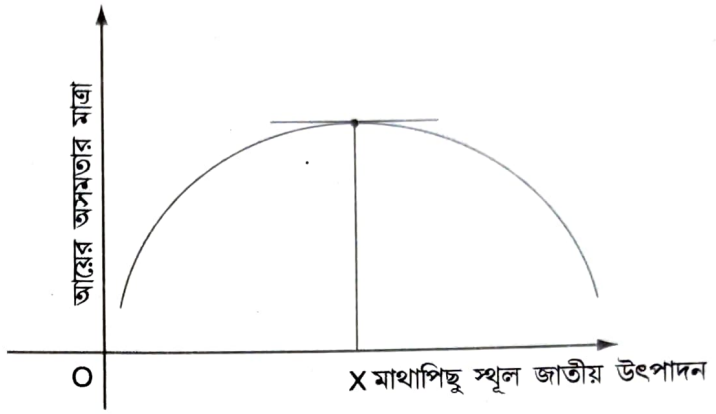

চিত্র ঃ 6.2

আয়-বৈষম্য রেখাটির আকৃতি কেন এমন উল্টোনো U আকৃতির হল সে ব্যাপারে অবশ্য কুজনেৎস্ নিজে তেমন কোন স্পষ্ট বা বিশদ ব্যাখ্যা দেননি। পরবর্তীকালে মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এর কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। 1976 সালে আলুওয়ালিয়া নিজেও অর্থনীতির বিকাশের স্তর এবং আয়-বৈষম্যের মাত্রার সম্পর্কটি নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা করেছিলেন। সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুজনেৎসের মত একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই আয়-বৈষম্য রেখার উল্টানো U আকৃতির কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেন আলুওয়ালিয়া।

প্রথমত, তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্বে কৃষিক্ষেত্র থেকে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে শ্রমের স্থানান্তর ঘটে। মজুরি পার্থক্যই এই স্থানান্তরের কারণ। এর ফলে অর্থনীতির দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দেখা দেয় এবং তা প্রথমদিকে বাড়তে থাকে। এরপর কালক্রমে, চাহিদা-যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এক সময় দুই ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরি পার্থক্য প্রশমিত হয়ে আসে। আয় বৈষম্য তাই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক পর্বের ঘটনা, উত্তর পর্বের নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের যোগান বাড়ে। ফলে প্রশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ-বহির্ভূত শ্রমিকের মধ্যে মজুরি-পার্থক্য বাড়তে থাকে। তারপর অর্থনীতিটি যত উন্নত হতে থাকে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের যোগানও তত বাড়তে থাকে। ফলে পুনরায় আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে প্রাথমিক পর্বের এই মজুরি-পার্থক্য। মাথাপিছু আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়-বৈষম্য প্রথমে বাড়ার এবং পরে কমার এটি একটি প্রধান কারণ।

এ সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়নের প্রথম দিকে কেন আয় বৈষম্য বাড়ে তার কয়েকটি ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। **প্রথমত,** উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় নানা কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে ঘটতে থাকে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে। ফলে ক্ষেত্রগত বৈষম্য বাড়তে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** শিল্পক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় কৌশল ব্যবহার করে। দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিক নিয়োগ করে। এদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বেশি। ফলে আয় বৈষম্য বাড়ে। **তৃতীয়ত,** উন্নয়নের প্রথম দিকে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা লোক তেমন ভালোমানের কাজ পায় না। মুটে, যোগাড়ে, কেবিন বয় প্রভৃতির কাজ করে। কিন্তু কিছু জমিদার তাদের টাকা শহরের জমিতে খাটায়। তাদের আয় দ্রুত হারে বাড়ে। এভাবে আয় বৈষম্য বাড়ে। **চতুর্থত, উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ে। এটিও আয় বৈষম্য**

তৈরি করে। **পঞ্চমত,** উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে উদ্যোক্তাদের আয় খুব দ্রুত হারে বাড়ে। এর ফলেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। **ষষ্ঠত,** আর্থিক সম্পদ বণ্টনেও সরকারের শহরাঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। এটিও আয় বৈষম্য বাড়ায়।

উন্নয়নের পরবর্তী স্তরে কেন আয় বৈষম্য কমে, তার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন কুজনেৎস্। **প্রথমত,** মাথাপিছু আয় উচ্চস্তরে পৌঁছে গেলে তারপর তা বৃদ্ধির হার নানা কারণে কমতে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** দেশটি যথেষ্ট উন্নত হয়ে যাবার পর সরকার কর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নানা আইন প্রণয়ন করে। এর ফলেও আয় বৈষম্য কমে।

এর সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করতে পারি। **তৃতীয়ত,** উন্নয়নের উচ্চস্তরে কৃষিভিত্তিক পণ্য ও গ্রামের হস্তশিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এর ফলে গ্রাম ও শহরের আয় বৈষম্য কিছুটা কমে। **চতুর্থত,** উন্নয়ন গতি প্রাপ্ত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। **পঞ্চমত,** উন্নয়নের উচ্চস্তরে শিল্পক্ষেত্রে বা বিদেশে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের আত্মীয়স্বজন ও নির্ভরশীলদের জন্য অর্থপ্রেরণ করে। এর ফলেও আয় বৈষম্য কমে।

কুজনেৎস্-এর উল্টানো U প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, যেমন, মরিস, ক্রেভিস এবং আলুওয়ালিয়া। তাঁরা তাদের সমীক্ষাতেও অনুরূপ ফল পেয়েছেন। অবশ্য টোডারো মনে করেন যে, কুজনেৎস্-এর Sample size খুব ক্ষুদ্র। তাছাড়া, Time Series সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে Cross section তথ্য ব্যবহার করা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন। Anand এবং Kanbur-ও একই মত পোষণ করেন। তবে মোটের উপর অর্থনীতিবিদেরা উল্টানো U প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন অর্থাৎ উন্নয়নের প্রথমে আয় বৈষম্য বাড়ে কিন্তু পরে তা কমে।